

ষষ্ঠ অধ্যায় জীবে পরিবহন

পরিবহন জীবদেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা সার্বক্ষণিকভাবেই ঘটে চলেছে। উদ্ভিদে পানি ও খনিজ পরিবহন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, খাদ্য চলাচলও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। মাটি থেকে গৃহীত পানি ও খনিজলবণ মূল থেকে পাতায় পৌঁছানো যেমন গুরুত্বপূর্ণ, পাতায় প্রস্তুত কৃত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবহনও তেমনি অতীব প্রয়োজনীয়। মানবদেহে পরিবহন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের মতো নয়। উদ্ভিদ ও মানবদেহের পরিবহন পদ্ধতি এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- উদ্ভিদে পরিবহনের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও পানির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদে পানি ও খনিজ পদার্থ শোষণ প্রক্রিয়া ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণের ফলে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন বর্ণনা করতে পারব।
- উদ্ভিদে পানি ও খনিজ পদার্থ পরিবহন ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রস্বেদনের ধারণা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রস্বেদনের হার নিয়ন্ত্রণে প্রভাবকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রস্বেদন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল তা মূল্যায়ন করতে পারব।
- উদ্ভিদে প্রস্বেদনের পরীক্ষা করতে পারব।
- মানবদেহে সংবহনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত উপাদানের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন গ্রুপের রক্তের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত গ্রুপ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রক্ত নির্বাচন করতে পারব।
- রক্তদানের নিয়মাবলি এবং এর সামাজিক দায়বদ্ধতা বর্ণনা করতে পারব।
- মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব।
- হৃদপিণ্ডের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- হৃদপিণ্ড গঠনগতভাবে যে এর কার্যক্রমের সাথে অভিযোজিত তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্ত সঞ্চালনে রক্তচাপের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আদর্শ রক্তচাপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কোলেস্টেরলের প্রকারভেদ, সীমা, উপকারিতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বর্ণনা করতে পারব।
- রক্ত সঞ্চালনে কোলেস্টেরলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্তে অস্বাভাবিকতার কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃদপিণ্ড সম্পর্কিত রোগের লক্ষণ, কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখার উপায় বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিশ্রামের অবস্থায় এবং শরীরচর্চার পর রক্তচাপ ও পালসরেট পরিমাপ করতে এবং দুই অবস্থানে পরিমাপকৃত রক্তচাপ ও পালসরেট বিশ্লেষণ করতে পারব।
- সঠিকভাবে রক্তচাপ ও পালসরেট করতে পারব।
- হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখার জন্য নিজে সচেতন হব এবং অন্যকে সচেতন করতে পারব।

উদ্ভিদ ও পানির সম্পর্ক

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না। আমরা জানি প্রোটোপ্লাজম জীবদেহের ভৌত ভিত্তি। এই প্রোটোপ্লাজমের শতকরা ৯০ ভাগই পানি। এ কারণেই পানিকে ফ্লুইড অফ লাইফ বলে। পানির পরিমাণ কমে গেলে তাই প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়ে মরে যেতে পারে। এছাড়া উদ্ভিদের দেহে যত বিপাকীয় বিক্রিয়া চলে তা পানির অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। উদ্ভিদদেহে পানির প্রয়োজনীয় দিকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

- ১। প্রোটোপ্লাজম সজীব রাখতে পানির বিকল্প নেই। একটি সংকুচিত প্রোটোপ্লাজমযুক্ত কোষকে বাঁচাতে চাইলে দেরি না করে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ২। প্রস্বেদন ও সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চালু রাখতে পরিমাণমতো পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। এজন্যই শুষক মৌসুমে বড় বড় উদ্ভিদেও পানি সেচ দিতে হয়।
- ৩। পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবক। বিপাকীয় অনেক বিক্রিয়ায় পানির গুরুত্ব অপরিসীম।
- ৪। উদ্ভিদের কোষ বৃদ্ধি ও চলনে পানির ভূমিকা রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উদ্ভিদ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি কোথায় ও কীভাবে পায়? উদ্ভিদ প্রধানত মূলের মাধ্যমে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। ৩টি প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে শোষণ কাজ সম্পাদন করে। প্রক্রিয়া তিনটি হলো ইমবাইবিশন, ব্যাপন, অভিস্রবণ।

- ১। **ইমবাইবিশন (Imbibition) :** এক খন্ড শুকনা কাঠের এক প্রান্ত পানিতে ডুবালে ঐ কাঠের খন্ডটি কিছু পানি টেনে নেবে। আমরা জানি কলয়েড জাতীয় শুকনা বা আধা শুকনা পদার্থ তরল পদার্থ শুষে নেয়। এ জন্যই কাঠের খন্ডটি পানি টেনে নিয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে ইমবাইবিশন বলে। সেলুলোজ, স্টার্চ, জিলাটিন ইত্যাদি হাইড্রোফিলিক পানিপ্রিয় পদার্থ। এরা তরল পদার্থের সংস্পর্শে এলে তা শুষে নেয় আবার তরল পদার্থের অভাবে সংকুচিত হয়ে যায়। কোষপ্রাচীর ও প্রোটোপ্লাজম কলয়েডধর্মী হওয়ায় ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে স্ফীত হয়ে উঠে। পানি শোষণের এটি একটি অন্যতম প্রক্রিয়া।

কাজ : ব্যাপন প্রক্রিয়ার পরীক্ষণ।

উপকরণ : একটি ছোট বাটি, আতর বা যে কোনো সুগন্ধী।

ব্যাপন প্রক্রিয়াটি প্রমাণ করতে আতর বা সুগন্ধী বাটিতে ঢেলে পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা কর।

- ২। **ব্যাপন (Diffusion) :** ঘরের এক কোণে কিছু সুগন্ধি ঢেলে দিলে তার সুগন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে যায়। কারণ এর ক্ষুদ্র কণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এক গ্লাস পানিতে কিছু চিনি ছেড়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্লাসের পানি মিষ্টি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে চিনির অণু পানিতে ছড়িয়ে পানিকে মিষ্টি স্বাদযুক্ত করে তোলে। এ প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। এটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া (Physical process)। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো দ্রবের অণু বেশি ঘনত্বের এলাকা থেকে কম ঘনত্বের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তাকে ব্যাপন প্রক্রিয়া বলে। একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের বেশি ঘনত্ববিশিষ্ট দ্রবণ হতে কম ঘনত্বের দ্রবণের দিকে দ্রাবকের ব্যাপিত হওয়ার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতাকে ব্যাপন চাপ বলে। একই বায়ু চাপে কোনো একটি দ্রবণ ও দ্রাবকের ব্যাপন চাপের যে পার্থক্য তাকে ব্যাপন চাপ ঘাটতি (Diffusion pressure deficit) বলে। পাতার মেসোফিল টিস্যুতে এই ব্যাপন চাপ ঘাটতির ফলে পানির ঘাটতি আছে এমন কোষ পাশের কোষ থেকে পানি টেনে নেয়। উদ্ভিদের পানি শোষণে ব্যাপনের গুরুত্ব অপরিসীম।

- ৩। **অভিস্রবণ (Osmosis) :** অভিস্রবণ কী তা কি তোমরা জান? আচ্ছা তোমরা কি খেয়াল করেছ যে মা যখন কিসমিস ভিজিয়ে রাখেন তার কিছুক্ষণ পর চুপসে থাকা কিসমিসগুলো ফুলে টসটসে হয়ে ওঠে। কী করে এসব হয় তা কি ভেবেছ কখনও? ঐ টসটসে কিসমিস যদি পুনরায় ঘন চিনির শরবতে ভিজিয়ে রাখ তাহলে দেখবে আবার ওগুলো চুপসে গেছে। কেন এমন হলো তা কি তোমরা ধারণা করতে পার? এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়াটি জীবন্ত কোষ ছাড়াও কৃত্রিমভাবে ল্যাবরেটরিতেও ঘটানো যায়। যদি দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ যাদের দ্রব ও দ্রাবক একই, একটি বৈষম্য ভেদ্য পর্দা (Selectively permeable membrane) দিয়ে আলাদা করা হয় তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি দ্রবণের ঘনত্ব সমান হয়ে যাবে। একই দ্রব ও দ্রাবকযুক্ত দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি বৈষম্য ভেদ্য পর্দা দ্বারা আলাদা করা হলে, দ্রাবক তার উচ্চ ঘনত্বের দিক থেকে নিম্ন ঘনত্বের দিকে প্রবাহিত হয়। দ্রাবকের বৈষম্য ভেদ্য পর্দা ভেদ করে তার উচ্চ ঘনত্বের দিক থেকে নিম্ন ঘনত্বের দিকে প্রবাহিত হওয়াকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া বলা হয়।

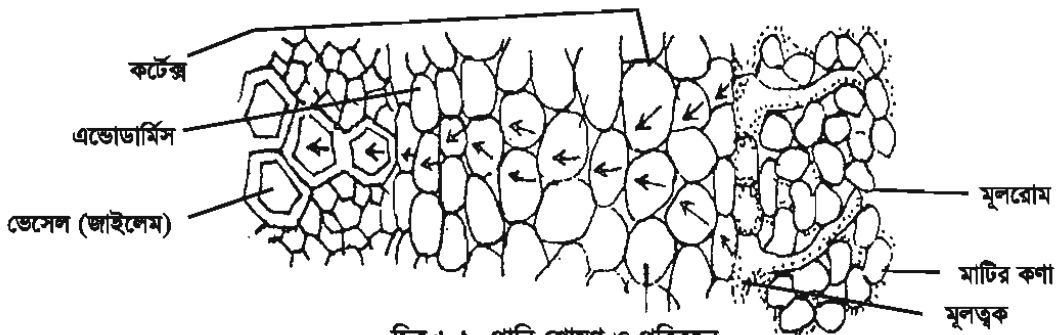
উপকরণ : একখন্ড আলু, ব্রেড, পেট্রিডিস, পানি, চিনি।

কাজ : কোষ থেকে কোষে অভিস্রবণের পরীক্ষণ।

আলু দিয়ে অসমোস্কোপ বানাও। চিনির শরবৎ ঢেলে অভিস্রবণের প্রমাণ দাও।

পানি ও খনিজ লবণ শোষণ : উদ্ভিদে পানি শোষণ ও খনিজ লবণ শোষণ ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় হয়। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা পানি শোষণ বিষয়টি সম্পর্কে আগে জানব।

- ক) পানি শোষণ :** সাধারণভাবে উদ্ভিদ মাটির কৈশিক পানি (Capillary water) তার মূলরোমের মাধ্যমে শোষণ করে। প্রস্বেদনের ফলে পাতার কোষে ব্যাপক চাপ ঘাটতির সৃষ্টি হয়। এর ফলে পাশের কোষ থেকে পানি এই কোষের দিকে ধাবিত হয়। একইভাবে ঐ দ্বিতীয় কোষটিতে আবার ব্যাপন চাপ ঘাটতি সৃষ্টি হয় এবং তার পাশের বা নিচের কোষ থেকে পানি টেনে নেয়। এভাবে ব্যাপক চাপ ঘাটতি ক্রমশ মূলরোম পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং একটি চোষক শক্তির সৃষ্টি হয়। এ চোষক শক্তির টানে মাটির কৈশিক পানি মূলরোমে ঢুকে পড়ে। মাটি থেকে মূলরোমে অভিস্রবণ ও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এ পানি প্রবেশ করে। এভাবে মূলরোম থেকে পানি মূলের কর্টেক্সে (Cortex) প্রবেশ করে। এ কাজটিকে কোষ থেকে কোষান্তর অভিস্রবণ (Cell to cell osmosis) পদ্ধতি বলে। একইভাবে পানি অন্তঃস্থক ও পরিচক্র হয়ে পরিবহন নালিকা গুচ্ছে (Vascular bundles) পৌঁছে যায়। পানি একবার পরিবহন কলায় পৌঁছে গেলে তা জাইলেম কলায় মাধ্যমে উপরের দিকে ও পাশের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এভাবে পানি বিভিন্ন শাখা প্রশাখা হয়ে উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছে যায়। এ কাজে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া কাজ করে সেগুলো হলো, অভিস্রবণ ও প্রস্বেদন।



চিত্র ৬.১: পানি শোষণ ও পরিবহন

খ) **খনিজ লবণ শোষণ** : অধিকাংশ উদ্ভিদ পানির সাথে কিছু পরিমাণ খনিজ লবণ শোষণ করে, কিছু লবণ মূলরোম দিয়ে শোষিত হলেও মূলত মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলই শোষণ অঞ্চল হিসেবে কাজ করে। খনিজ লবণ শোষিত হয় আয়ন হিসেবে। শোষণ প্রধানত দুটি উপায়ে হয়ে থাকে। যথা- ১। নিষ্ক্রিয় শোষণ ও ২। সক্রিয় শোষণ।

১। **নিষ্ক্রিয় শোষণ (Passive absorption)** : উদ্ভিদের এ প্রক্রিয়ায় মূলরোম ইমবাইবিশন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পানি শোষণ করে, কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় না।

২। **সক্রিয় শোষণ (Active absorption)** : সক্রিয় শোষণে খনিজ লবণ পরিবহনের জন্য কোষে উৎপন্ন বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয়।

উদ্ভিদে পরিবহন : উদ্ভিদে পরিবহন বলতে মাটি থেকে শোষিত পানি ও খনিজ লবণ এবং পাতায় প্রস্তুত খাদ্যের চলাচলকে বুঝায়।

আমরা জানি জাইলেম ভেসেলের মাধ্যমে পানি ও খনিজ লবণ উদ্ভিদে উপরের দিকে উঠে। প্রস্বেদন টান, কৈষিক শক্তি ও মূলজ চাপের ফলে কোষরস উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছে যায় বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন। এভাবে পাতায় পানি পৌঁছালে সেখানে খাদ্য প্রস্তুত হয়। প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন এলাকায় পরিবহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ফ্লোয়েম টিস্যু। এ খাদ্য ফ্লোয়েমের সিভনলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈব যৌগ ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে বিপরীত দিকে একইসাথে চলাচল করে। উদ্ভিদের নিচের দিকের যৌগগুলো নিচের দিকে, উপরে সংশ্লেষিত যৌগগুলো উপরের দিকে এবং উদ্ভিদের মাঝামাঝি এলাকায় সংশ্লেষিত পদার্থগুলো উপরে বা নিচে যে কোনো দিকে প্রবাহিত হয়।

উদ্ভিদে পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা : পরিবহন অর্থ একস্থান থেকে অন্য স্থানে কোনো পদার্থের স্থানান্তর। পানি ও খনিজ লবণের চলাচলকে উদ্ভিদে পরিবহন বলা হয়। উদ্ভিদে পানি ও খনিজ দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার কথা সব বিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই পানি ও খনিজ পদার্থ উদ্ভিদের কাছে আসতে হলে সেগুলোকে অবশ্যই বিক্রিয়াস্থলে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য পানি ও খনিজের পরিবহন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলরোম দিয়ে পানি ও খনিজ লবণ শোষিত হয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কটেক্সের মধ্য দিয়ে জাইলেম ভেসেলে পৌঁছায় এবং প্রস্বেদন স্রোতের সাথে ধীরে ধীরে পাতায় গিয়ে পৌঁছে। সেখানে খাদ্য তৈরি হয়। পাতা থেকে তৈরি খাদ্য ফ্লোয়েমের সিভনল দিয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে যায়। কখনও জাইলেম ভেসেল বা ফ্লোয়েমের সিভনল কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে উদ্ভিদের মৃত্যু অবধারিত। এজন্য বলা যায় উদ্ভিদের পরিবহন উদ্ভিদ জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

পানি ও খনিজ পদার্থের পরিবহন (Translocation of water and minarals)

আমরা ইতোপূর্বে অভিস্রবণ ও প্রস্বেদন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছি। অভিস্রবণের প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে মূল দিয়ে পানি শোষণ করে। মূলরোমের সাহায্যে প্রধানত এ কাজটি হয়। পাশাপাশি উদ্ভিদ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ পুষ্টিও শোষণ করে। অবশ্য খনিজ পুষ্টি শোষণের পদ্ধতি পানি শোষণ পদ্ধতি থেকে আলাদা। এ বিষয়ে উচ্চতর শ্রেণিতে তোমরা বিস্তারিত জানতে পারবে। কোষস্থ পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণকে একত্রে কোষরস (Cell sap) বলে। এবার আমরা কোষরস মূল থেকে উদ্ভিদের সর্বোচ্চ শাখায় ও পাতায় কীভাবে পৌঁছায় তা জানব।

কোষরসের আরোহণ (Ascent of sap) : মূল পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে। এ কোষরস বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে থাকে। একইসাথে কোষরসের পার্শ্ব পরিবহনও চলতে থাকে। কোষরস পরিবহনকে

দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা— ১) মাটিস্থ পানি ও খনিজ লবণসমূহের মূলরোম থেকে মূলের পরিবহন কলায় পৌঁছানো ও ২) মূলের পরিবহন কলা থেকে পাতায় পরিবহন করা। প্রথম ধাপে অভিস্রবণ, ব্যাপন ও প্রস্বেদন টান ইত্যাদি পানি ও খনিজ লবণ শোষণ ও পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মূলরোম দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ পদার্থ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোম থেকে পাশের কোষে গমন করে। ঐ কোষ থেকে তা পুনরায় পাশের কোষে যায়। এভাবে কোষ থেকে কোষে পানি ও খনিজ পদার্থ চলতে চলতে একসময় মূলের পরিবহন টিস্যু হয়ে এবং কাণ্ডের পরিবহন কলা বেয়ে পাতার মেসোফিল কলায় পৌঁছায়।

কাজ : উদ্ভিদে রস উত্তোলন পরীক্ষণ।

উপকরণ : *Peperomia* উদ্ভিদ বোতল, পানি ও স্যাক্সানিন।

পদ্ধতি : একটি বোতলে কিছু পানি নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা স্যাক্সানিন নাও। মূলসহ একটি তাজা *Peperomia* উদ্ভিদ এমনভাবে স্থাপন কর যেন মূলগুলো পানিতে ডুবে থাকে। এ অবস্থায় বিকারকে কয়েক ঘণ্টার জন্য রেখে দাও ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল খাতায় লেখ।



সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন

তোমরা আগেই জেনেছ যে উদ্ভিদ অভিস্রবণ পদ্ধতিতে পানিগ্রহণ করে। এ পানি জাইলেম ভেসেলে মাধ্যমে সুউচ্চ বৃক্ষের সর্বোচ্চ স্থানের পাতায়ও পৌঁছে যায়। এই পাতাই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এ পানি ব্যবহার করে। বায়ু থেকে CO_2 গ্রহণ করে পানির সাথে মিশিয়ে আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্ট শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে। এ উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে চলে যায়। উদ্ভিদের প্রতিটি কোষই এ খাদ্য ব্যবহার করে শ্বসন প্রক্রিয়ায় তার বিপাকীয় কাজ চালাতে শক্তির যোগান দেয়। এ কাজের পর যতটুকু খাদ্য অবশিষ্ট থাকে তা উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সঞ্চিত থাকে। গোলআলু (কাণ্ড), মিষ্টি আলু (মূল), ঘৃতকুমারী (পাতা) এবং বিভিন্ন ফল ও বীজে এ খাদ্য জমা থাকে। আমরা এবার দেখব সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন খাদ্য কীভাবে উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

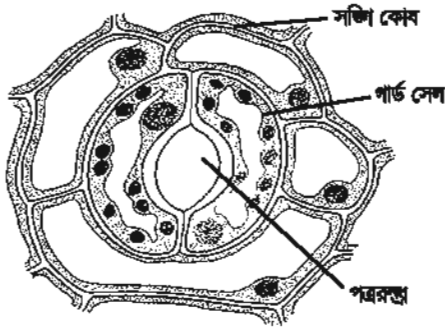
ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহন (Phloem translocation) : উদ্ভিদের মূল ও পাতা পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করায় খাদ্য চলাচলে একটি দ্রুত ও কার্যকর পরিবহন ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক। এ কাজটি ফ্লোয়েমের সিভনল করে থাকে। ফ্লোয়েম পরিবহন নালিকাগুচ্ছের অন্যতম গুচ্ছ। আমরা জেনেছি যে পরিবহন কলাগুচ্ছ জাইলেমগুচ্ছ ও ফ্লোয়েমগুচ্ছ থাকে। ফ্লোয়েমগুচ্ছ সিভনল, সঞ্জীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও বাস্টফাইবার থাকে। সিভনল এক প্রকার কেন্দ্রিকাবিহীন ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত সঞ্জীব কোষ। লম্বালম্বিভাবে এরা একটির সাথে অন্যটি যুক্ত হয়ে উদ্ভিদদেহে জালের ন্যায় গঠন সৃষ্টি করে। দুটো কোষের মধ্যবর্তী অনুগ্রন্থ প্রাচীরটি স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হয়ে চালুনির ন্যায় আকার ধারণ করে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সহজেই এক কোষ থেকে অন্য কোষে চলাচল করতে পারে। শীতকালে এ রন্ধ্রগুলো ক্যালোজ নামক রাসায়নিক পদার্থ জমে ছোট হয়, তাই খাদ্য চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। গ্রীষ্মের আগমনে ক্যালোজ গলে যায়, তাই খাদ্য চলাচল বেড়ে যায়।

প্রস্বেদন (Transpiration) : পানি ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। উদ্ভিদ প্রধানত মূল দ্বারা তার প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করে। শোষিত পানির অতি সামান্য অংশ উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলীর জন্য ব্যয় হয়। বাকি অংশ উদ্ভিদ তার বায়বীয় অংশ দ্বারা বাষ্পাকারে বাইরে বের করে দেয়। সাধারণত স্থলজ উদ্ভিদ যে শারীরতত্ত্বীয় প্রক্রিয়ায় তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানি বের করে দেয় তাই প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া। এ কাজটি তার বায়বীয়

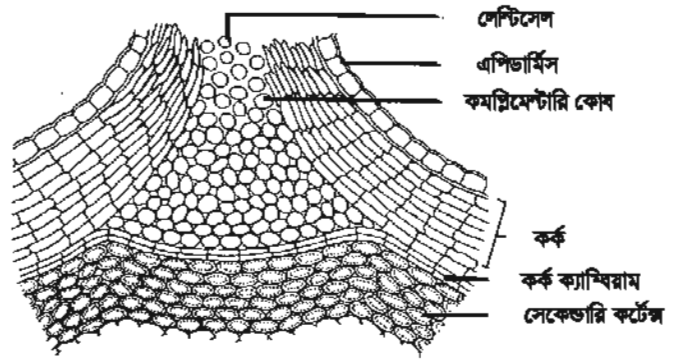
অজ্ঞোর কোনো অংশের মাধ্যমে ঘটে তার ভিত্তিতে এদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা-ত্বকরশ্মীয় প্রস্বেদন, কিউটিকুলার প্রস্বেদন ও লেন্টিকুলার প্রস্বেদন।

১) পত্ররশ্মীয় প্রস্বেদন (Stomatal transpiration) : পাতায়, কটিকাণ্ডে, ফুলের বৃতি ও পাপড়িতে দুটি রক্ষীকোষ বিশিষ্ট এক প্রকার রস্ত্র থাকে। এদেরকে পত্ররস্ত্র (Stomata) বলে। কোনো উদ্ভিদের মোট প্রস্বেদনের ৯০-৯৫% প্রস্বেদন হয় পত্ররস্ত্রের মাধ্যমে।

২) কিউটিকুলার প্রস্বেদন (Cuticular transpiration) : উদ্ভিদের বহিঃত্বকে বিশেষ করে পাতার উপরে ও নিচে কিউটিনের আবরণ থাকে। এ আবরণকে কিউটিকল বলে। কিউটিকল ভেদ করে কিছু পানি বাষ্পাকারে বাইরে বের হয়। এ প্রক্রিয়াকে কিউটিকুলার প্রস্বেদন বলে।



চিত্র- ৬.২: একটি পত্ররস্ত্র।



চিত্র-৬.৩: একটি লেন্টিসেল।

৩) লেন্টিকুলার প্রস্বেদন (Lenticular transpiration) : উদ্ভিদে গৌণ বৃদ্ধি হলে কাণ্ডের বাকল ফেটে লেন্টিসেল নামক ছিদ্র সৃষ্টি হয়। লেন্টিসেলের ভিতরের কোষগুলো আলগাভাবে সজ্জিত থাকে এবং এর মাধ্যমে কিছু পানি বাইরে বেরিয়ে যায়। একে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন বলে।

প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদটি যেমন বাষ্পাকারে অতিরিক্ত পানি মুক্ত করে তেমন এর ফলে সৃষ্ট টানে পানি শোষিত হয়। এ প্রক্রিয়াটি অনেকগুলো প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল। এদের মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

ক) বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ ও খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ।

ক) বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ

উদ্ভিদ দেহের বাইরে অবস্থান করে যারা প্রস্বেদনকে প্রভাবিত করে তাদেরকে বাহ্যিক প্রভাবক বলে, যথা-

১। তাপমাত্রা (Temperature) : তাপমাত্রার তারতম্যের সঙ্গে প্রস্বেদনের হারও ওঠানামা করে। অধিক তাপে পানি সহজেই বাষ্পে পরিণত হতে পারে ফলে প্রস্বেদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রস্বেদনের হারও দ্রুততর হয়। তাপমাত্রা কমে গেলে তাই স্বাভাবিক নিয়মেই প্রস্বেদনের হারও কমে যায়।

২। আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative humidity) : বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ও বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতার আনুপাতিক হারকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। কোনো একটি এলাকার বায়ুমণ্ডলে অধিক জলীয়বাষ্প থাকা সত্ত্বেও অধিক ধারণ ক্ষমতার জন্য তা শুষ্ক হতে পারে। আবার কম জলীয়বাষ্প থাকা সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডলের কম ধারণ

ক্ষমতার জন্য এটি সিক্ত হতে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে বায়ু অসম্পৃক্ত থাকে ও জলীয়বাষ্প গ্রহণ করতে পারে কিন্তু অধিক হলে বায়ু সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায় এবং বেশি থাকলে হার কমে যায়।

৩। আলো (Light) : আলোর উপস্থিতিতে ত্বকরস্ত্র খুলে যায়, ফলে প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অন্ধকারে ত্বকরস্ত্র বন্ধ থাকায় এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। আলোর তারতম্যের জন্য ত্বকরস্ত্রের আকারেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ফলে প্রস্বেদনের হারও ঊঠানামা করে। আলো উদ্ভিদদেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমেও প্রস্বেদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

৪। বায়ুপ্রবাহ (Wind) : প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদের চারদিকের বায়ু সিক্ত হয়ে ওঠে, ফলে এই প্রক্রিয়ার হার কমতে থাকে। যখন বায়ুপ্রবাহ সম্পৃক্ত বায়ু দূরে সরিয়ে দেয় তখন এই হার আবার বৃদ্ধি পায়। বায়ু প্রবাহের ফলে পত্রসমূহ আন্দোলিত হয় ও ত্বকরস্ত্র চাপ পড়ে। ফলে অধিক হারে জলীয়বাষ্প রস্ত্র পথে বের হয়। এ সব কারণে বায়ু প্রবাহের তারতম্যে প্রস্বেদন হারেরও তারতম্য ঘটে। বায়ুচাপ বৃদ্ধিতে বাষ্পীয়ভবন ক্রিয়া হ্রাস পায়, ফলে প্রস্বেদন কমে যায়। আবার বায়ুচাপ কমে গেলে বাষ্পীয়ভবন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়।

খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ

১। ত্বকরস্ত্র : ত্বকরস্ত্রের সংখ্যা, আয়তন, গঠন ও অবস্থানের উপর প্রস্বেদন হারে তারতম্য ঘটে।

২। পত্রের সংখ্যা : পত্রের সংখ্যা, আয়তন, গঠন ও অবস্থানের উপর প্রস্বেদন হারে তারতম্য লক্ষ করা যায়।

৩। পত্রফলকের আয়তন : পত্রফলকের আয়তন বড় হলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। একইভাবে এ আয়তন কমে গেলে প্রস্বেদনের হারও কমে যায়।

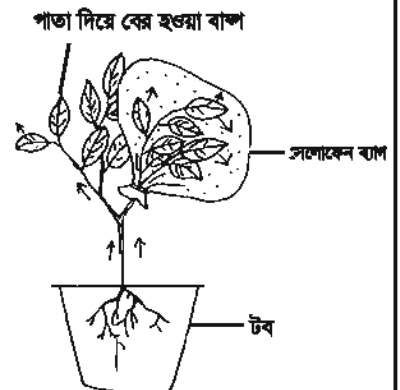
৪। উদ্ভিদের বায়ব অঙ্গের আয়তন : পাতা ও কাণ্ডসহ উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের কলবর বৃদ্ধি পেলে প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়।

এছাড়া কিউটিকলের উপস্থিতি, স্পনজি প্যারেনকাইমার পরিমাণ ইত্যাদিও প্রস্বেদন হারের তারতম্য ঘটায়।

কাজ : প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ যে পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় তা পরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণ কর।

উপকরণ : এ পরীক্ষার জন্য দরকার হবে টবসহ একটি সতেজ উদ্ভিদ, একটি কাচের বেলজার বা বড় ও সরু সেলোফেন ব্যাগ, সুতা বা ক্লিপ এবং পরিমাণমতো কিছু পানি।

পদ্ধতি : প্রথমেই টবসহ গাছটিকে টেবিলের উপর বসিয়ে দিতে হবে এবং টবে পরিমাণমতো পানি ঢেলে দিতে হবে। এবার কিছু পাতাসহ একটি শাখাকে সেলোফেন ব্যাগ দিয়ে মুড়ে সুতা দিয়ে বেঁধে বা ক্লিপ দিয়ে আটকে অথবা বেলজার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ভিতরের বাষ্প বের হতে বা বাইরের বাতাস ঢুকতে না পারে। এ অবস্থায় টবটি এক ঘণ্টা রেখে দিতে হবে।



চিত্র-৬.৪ : প্রস্বেদনের পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ : এক ঘণ্টা পর দেখা যাবে যে, সেলোফেন ব্যাগের ভিতরের গায়ে পানির ফোঁটা জমে আছে এবং পুরো ব্যাগটি অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। কেন এমন হলো তা কি তোমরা বুঝতে পারছ?

সিন্ধান্ত : যেহেতু সেলোফেন ব্যাগে অন্য কোনো পানি ঢোকার সুযোগ ছিল না তাই ঐ পানির কণাগুলো যে পাতা থেকেই বেরিয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এতে প্রমাণিত হলো যে, উদ্ভিদ তার বায়বীয় অঙ্গ দ্বারা পানি বাষ্পাকারে দেহের বাইরে বের করে দেয়।

সতর্কতা :

- ১) টবের উদ্ভিদটি অবশ্যই সতেজ হতে হবে।
- ২) সেলোফেন ব্যাগের মুখ ভালোভাবে বেঁধে বায়ু নিরোধী করতে হবে।

প্রস্বেদন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল (Transpiration is a necessary evil)

প্রস্বেদনের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্তমানে সকল বিজ্ঞানীই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন বলে মনে করা হয়। যেকোনো সজীব উদ্ভিদ কোষের বিপাকীয় কার্যক্রম এ প্রক্রিয়ার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রস্বেদনের ফলে জাইলেম বাহিকায় টান পড়ে যাকে প্রস্বেদন টান বলে। এই টানের ফলে উদ্ভিদের মূলরোম পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে এবং শোষিত পানি ও খনিজ লবণ পাতায় পরিবাহিত হয়। এ টানের ঘাটতি হলে পানি শোষণ কমে যাবে এবং খাদ্য প্রস্তুতসহ অনেক বিপাকীয় কার্যক্রম শ্লথ হয়ে যাবে। প্রস্বেদনের ফলে পাতার মেসোফিলে ব্যাপন চাপ ঘাটতি সৃষ্টি হয় যা পানি শোষণে সাহায্য করে। উদ্ভিদ প্রস্বেদনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পত্রফলক কর্তৃক শোষিত তাপশক্তি হ্রাস করে পাতার কোষগুলোর তাপমাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখে।

অন্যদিকে, গুরুত্বপূর্ণ এই প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের বহু ধরনের উপকার করলেও কিছু অপকারী ভূমিকাও এর রয়েছে। যেমন— পানি শোষণের চেয়ে প্রস্বেদনে পানি হারানোর হার অধিক হলে তা উদ্ভিদের জন্য পানি ও খনিজের ঘাটতি দেখা দেবে। এর ফলে উদ্ভিদটির মৃত্যুও হতে পারে। মাটিতে পানির ঘাটতি থাকলে শোষণ কম হবে কিন্তু প্রস্বেদন পূর্বের ন্যায় চলতে থাকবে। এ অবস্থাকে ঠেকাতে প্রকৃতি শীত মৌসুমে বহু উদ্ভিদের পাতা ঝরিয়ে দেয়। প্রস্বেদনের অভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাপন চাপ ঘাটতি হবে না, ফলে অভিস্রবণ কম হবে।

এমতাবস্থায় বলা যায় প্রস্বেদন কিছু ক্ষতিসাধন করলেও এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি কার্যক্রম। বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যের জন্য বিজ্ঞানী কার্টিস প্রস্বেদনকে ‘প্রয়োজনীয় ক্ষতি’ (Necessary evil) নামে অভিহিত করেছেন।

মানবদেহে সংবহন : রক্ত জীবনীশক্তির মূল। রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্ত দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং কোষে অক্সিজেন ও খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে। ফলে দেহের সব কোষ সজীব ও সক্রিয় থাকে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত প্রতিনিয়ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ এবং অংশে চলাচল করে তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। এ তন্ত্রে প্রবাহিত রক্তের মাধ্যমেই খাদ্য, অক্সিজেন এবং রক্তের বর্জ্য পদার্থ দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয়।

মানবদেহে রক্তপ্রবাহ কেবল হৃদপিণ্ড এবং রক্তনালিসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কখনও বাইরে আসে না। এ ধরনের সংবহনতন্ত্রকে বন্ধ সংবহনতন্ত্র (Close circulatory system) বলা হয়। সারাদেহে রক্ত একবার সম্পূর্ণ পরিভ্রমণের জন্য মাত্র এক মিনিট বা তার চেয়েও কম সময় লাগে। বন্ধ সংবহনতন্ত্রের বড় সুবিধা হলো এ ব্যবস্থায়, ১) রক্ত সরাসরি দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গিয়ে পৌঁছে, ২) রক্তবাহী নালির ব্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো বিশেষ অঙ্গে রক্ত প্রবাহের পরিমাণ দেহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ৩) রক্ত বিভিন্ন অঙ্গে পরিভ্রমণ করে দ্রুত হৃদপিণ্ডে ফিরে আসে।

অন্যান্য তন্ত্রের তুলনায় রক্ত সংবহনতন্ত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলেও এর গঠনশৈলী মোটামুটি সাধারণ। এ তন্ত্রকে সাধারণত দুটি অংশে ভাগ করা হয়। যথা— ১. রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood Circulatory system) : হৃদপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালি নিয়ে গঠিত এবং ২. লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system) : লসিকা, লসিকানালি ও ল্যাকটিয়েলনালি নিয়ে গঠিত।

রক্ত (Blood)

তোমরা নিশ্চয় গরু, ছাগল ও মুরগি জবাই করতে দেখেছ। জবাই করার স্থান থেকে ফিন্‌কি দিয়ে লাল রঙের যে তরল পদার্থ বের হয় তাই রক্ত। এটি একটি অস্বচ্ছ, তরল পদার্থ। রক্ত হৃদপিণ্ড, শিরা, উপশিরা, ধমনি, শাখা ধমনি ও কৈশিকনালি পথে আবর্তিত হয়। লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে রক্তের রঙ লাল দেখায়। এটি ক্ষারধর্মী, লবণাক্ত স্বাদযুক্ত পদার্থ। হাড়ের লাল অস্থিমজ্জাতে রক্তকণিকার জন্ম।

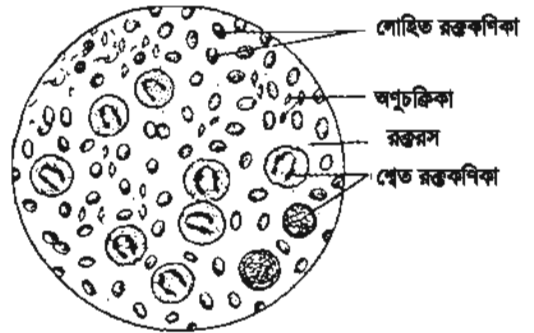
রক্তের উপাদান

রক্ত এক প্রকার তরল যোজক কলা রক্ত, রক্তরস ও কয়েক প্রকার রক্তকণিকার সমন্বয়ে গঠিত।

রক্তরস (Plasma) : রক্তের বর্ণহীন তরল অংশকে রক্তরস বলে। সাধারণত রক্তের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ রক্তরস। রক্তরসের প্রধান উপাদান পানি। এছাড়া বাকি অংশে কিছু আমিষ, জৈবযৌগ ও সামান্য অজৈব লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এর মধ্যে যে পদার্থগুলো বিদ্যমান তা হলো—

১. আমিষ, যথা— অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন এবং ফাইব্রিনোজেন।
২. গ্লুকোজ, ৩. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্বিবিশিষ্ট ৪. খনিজ লবণ, ৫. ভিটামিন,
৬. হরমোন, ৭. এস্টিবডি এবং ৮. বর্জ্যপদার্থ যেমন— কার্বন

ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি। এছাড়া সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ও অ্যামাইনো এসিড সামান্য পরিমাণে থাকে। আমরা যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি তা পরিপাক হয়ে অন্ত্রের গাত্রে শোষিত হয় ও রক্তরসে মিশে যায় এবং দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়। পুষ্টিকর দ্রব্যাদি দেহকোষগুলো গ্রহণ করে দেহের পুষ্টি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করে।



চিত্র ৬.৫: রক্তের উপাদান

রক্তকণিকা (Blood corpuscles)

মানবদেহে তিন প্রকার রক্তকণিকা দেখা যায়, ১) লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood Corpuscles), ২) শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Corpuscles) এবং ৩) অণুচক্রিকা (Blood Platelets)।

১) লোহিত রক্তকণিকা : মানবদেহে তিন প্রকার রক্তকণিকার মধ্যে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং শ্বাসকার্যে অক্সিজেন পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না, দেখতে অনেকটা বৃন্তের মতো ঘি-অবতল। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে প্রায় ৫০ লক্ষ। শ্বেত রক্তকণিকার চেয়ে প্রায় ৫০০ গুণ বেশি। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা কম থাকে। তুলনামূলকভাবে শিশুদের দেহে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ বেশি থাকে। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হয়, আবার সমপরিমাণে তৈরিও হয়।

লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন, অক্সিহিমোগ্লোবিনরূপে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন করে।

হিমোগ্লোবিন : হিমোগ্লোবিন এক ধরনের রক্তক পদার্থ। লোহিত রক্তকণিকায় এর উপস্থিতির কারণে রক্ত লাল দেখায়। রক্তে উপযুক্ত পরিমাণ হিমোগ্লোবিন না থাকলে রক্তাঙ্গতা বা রক্তশূন্যতা (Anemia) দেখা দেয়। বাংলাদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী এ রোগে ভুগে। এ রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে সুখম খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।



চিত্র ৬.৬: বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

২) **শ্বেত রক্তকণিকা :** মানুষের রক্তে কয়েক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। এদের আকার অনিয়মিত, বড় ও সংখ্যায় লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে অনেক কম। প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে ৫-১০ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। লাল অস্থিমজ্জা ও লসিকাগ্রন্থিতে শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি হয়। এদের রং নেই, কিন্তু নিউক্লিয়াস আছে। শ্বেত রক্তকণিকা আকার বদলাতে পারে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। শ্বেত রক্তকণিকা ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে রোগজীবাণু ভক্ষণ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম ফ্যাগোসাইটোসিস। মৃত শ্বেত রক্তকণিকা পুঁছে পরিণত হয়। রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অতিমাত্রায় বেড়ে গেলে লিউকেমিয়া রোগ হয়। শ্বেত রক্তকণিকা দেহে প্রহরীর মতো কাজ করে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ধ্বংস করে এবং অ্যান্টিবডি তৈরি করে।

৩) **অণুচক্রিকা :** অণুচক্রিকা আকারে ছোট, বর্জুলাকার ও বর্ণহীন। এরা গুচ্ছাকারে থাকে। প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার অণুচক্রিকা থাকে। অস্থিমজ্জার মধ্যে অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়। অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। কোনো রক্তবাহী নালির ক্ষতি হলে এরা অনতিবিলম্বে থ্রোম্বোপ্লাস্টিন নামক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য নিঃসরণ করে। যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। রক্তে উপযুক্ত পরিমাণ অণুচক্রিকা না থাকলে রক্তপাত সহজে ক্ধ হয় না। ফলে অনেক সময় রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকে।

কাজ : নিচের ছকটি খাতায় আঁক ও পূরণ কর।

লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে পার্থক্য :

বৈশিষ্ট্য	লোহিত রক্তকণিকা	শ্বেত রক্তকণিকা
১. নিউক্লিয়াস		
২. আকার		
৩. হিমোগ্লোবিন		
৪. সংখ্যা		
৫. কাজ		

রক্তের কাজ

রক্ত দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি দেহের নানাবিধ কাজ করে, যেমন—

১. অক্সিজেন পরিবহন : লোহিত রক্তকণিকা অক্সিহিমোগ্লোবিনরূপে কোষে অক্সিজেন পরিবহন করে।
২. কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারণ : রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোষগুলোতে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় রক্তরস সোডিয়াম বাই কার্বনেটরূপে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে এবং নিঃশ্বাস বায়ুর সাথে ফুসফুসের সাহায্যে দেহের বাইরে বের করে দেয়।
৩. খাদ্যসার পরিবহন : রক্তরস গ্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড, চর্বি কণা ইত্যাদি কোষে সরবরাহ করে।
৪. তাপের সমতা রক্ষা : দেহের মধ্যে অনবরত দহনক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে। এতে করে বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন মাত্রার তাপ সৃষ্টি হয় এবং তা রক্তের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে দেহের সর্বত্র তাপের সমতা রক্ষা হয়।
৫. বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন : রক্ত দেহের সব ধরনের দূষিত ও বর্জ্য পদার্থ বহন করে এবং বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে সেসব ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে নিষ্কাশন করে।
৬. হরমোন পরিবহন : হরমোন নালিবিহীন গ্রন্থিতে তৈরি এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বা রস। এই রস সরাসরি রক্তে মিশে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত হয় এবং বিভিন্ন জৈবিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৭. রোগ প্রতিরোধ : কয়েক প্রকারের শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দেহকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এন্টিবডি ও এন্টিজেন উৎপাদনের মাধ্যমে রক্ত দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৮. রক্ত জমাট বাঁধা : দেহের কোনো অংশ কেঁটে গেলে অনুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং দেহের রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

ব্লাড গ্রুপ বা রক্তের গ্রুপ

একজন আশঙ্কাজনক বা মূর্খ রোগীর জন্য রক্তের প্রয়োজন, তার রক্তের গ্রুপ ‘বি’ পজেটিভ। তোমরা এ রকম বিজ্ঞাপন প্রায়শই টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাও। রক্তের গ্রুপ বা ব্লাড গ্রুপ কী? কেনইবা ব্লাড গ্রুপ জানা প্রয়োজন? অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন ব্যক্তির লোহিত রক্ত কণিকায় ‘A’ এবং ‘B’ নামক দুই ধরনের এন্টিজেন (Antigens) থাকে এবং রক্তরসে ‘a’ ও ‘b’ দুই ধরনের এন্টিবডি (antibodies) থাকে। এই এন্টিজেন ও এন্টিবডির উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা যায়। একে ব্লাড গ্রুপ বলে। বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ড স্টেইনার ১৯০১ সালে মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করে তা ‘A’, ‘B’ ‘O’ এবং ‘AB’ এ চারটি গ্রুপের নামকরণ করেন। আজীবন একজন মানুষের রক্তের গ্রুপ একই রকম থাকে, পরিবর্তন হয় না।

নিচের সারণিতে রক্তের গ্রুপের এন্টিবডি ও এন্টিজেনের উপস্থিতি দেখানো হলো—

রক্তের গ্রুপ	এন্টিজেন (লোহিত রক্তকণিকায়)	এন্টিবডি (রক্তরসে)
A	A	b
B	B	a
A B	A, B	নেই
O	নাই	a, b

আমরা উপরের সারণিতে রক্তে বিভিন্ন এন্টিজেন ও এন্টিবডির উপস্থিতি দেখেছি। এর ভিত্তিতে আমরা ব্লাড গ্রুপকে এভাবে বর্ণনা করতে পারি। যেমন—

১. A গ্রুপ : এ শ্রেণির রক্তে A এন্টিজেন ও b এন্টিবডি থাকে।
২. B গ্রুপ : এ শ্রেণির রক্তে B এন্টিজেন ও a এন্টিবডি থাকে।
৩. A, B গ্রুপ : এই শ্রেণির রক্তে A ও B এন্টিজেন থাকে এবং কোনো এন্টিবডি থাকে না।
৪. O গ্রুপ : এ শ্রেণির রক্তে কোনো এন্টিজেন থাকে না কিন্তু a ও b এন্টিবডি থাকে।

সারণি : মানুষের রক্তে গ্রুপ অনুযায়ী দাতা ও গ্রহীতার তালিকা—

রক্তের গ্রুপ	যে গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A	A, A B	A ও O
B	B, A B	B ও O
A B	A B	সব গ্রুপ
O	A, B, AB, O	O

উপরের সারণিটি লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে O গ্রুপের রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তি সব গ্রুপের রক্তের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারে। এদের বলা হয় সর্বজনীন রক্তদাতা (Universal donor)। A B রক্তধারী ব্যক্তি যেকোনো ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করতে পারেন। তাই তাকে সর্বজনীন রক্তগ্রহীতা (Universal recipient) বলা হয়।

রক্তদান ও সামাজিক দায়বদ্ধতা : আঘাত, দুর্ঘটনা, শল্যচিকিৎসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হলে দেহে রক্তের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য ঐ ব্যক্তির দেহে রক্ত সংযোজনের প্রয়োজন হয়। জরুরি ভিত্তিতে এই রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য রোগীর দেহে অন্য মানুষের রক্ত দিতে হয়। অন্যকে রক্তদান করা বর্তমানে একটি সাধারণ ঘটনা। জরুরি অবস্থায় অন্য ব্যক্তির রক্ত সরাসরি বা ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা রক্ত রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। কোনো ব্যক্তির শিরার মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে অন্যের রক্ত প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকে রক্ত সংযোজন (Blood transfusion) বলে। এটি একটি চমৎকার ফলপ্রসূ ব্যবস্থা, যার ফলে রোগীর প্রাণ রক্ষা হয়। তবে কোনো অবস্থাতেই রোগীর রক্তের গ্রুপ ও প্রকৃতি পরীক্ষা না করে রোগীর দেহে অন্য কোনো ব্যক্তির বা ব্লাড ব্যাংকে রক্ষিত রক্ত প্রবেশ করানো উচিত নয়। ব্যতিক্রম হলে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়ে রোগীর জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। যেমন— রক্তকণিকাগুলের জমাট বাঁধা, বিশ্লিষ্ট হওয়া, জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব ও প্রস্রাবের সাথে হিমোগ্লোবিন নির্গত হওয়া ইত্যাদি।

আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হয়। মনে রাখতে হবে এটি আমাদের সবার জন্য একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা। যেহেতু রক্তের কোনো বিকল্প নেই, তাই এরূপ অবস্থায় অনেক সময় প্রচুর রক্তের প্রয়োজন হয় এবং অন্যের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে ঐ জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে হয়। এরূপ জরুরি পরিস্থিতিতে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।

রক্ত সঞ্চালনের আগে রোগীর রক্তের শুধু গ্রুপই নয়, রক্তের রেসার্স ফ্যাক্টর (Rh-factor) ও রোগ-জীবাণুর উপস্থিতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। রোগীর জীবন সংকটাপন্ন অবস্থায় রক্ত সঞ্চালন করতে হলে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ জানা না থাকলে O এবং Rh⁻ নেগেটিভ রক্ত সঞ্চালন করা অধিক নিরাপদ।

অন্যকে রক্তদান করা একটি মহৎ কাজ। এতে রক্তদাতার নিজের কোনো ক্ষতি হয় না। একজন সুস্থ মানুষের দেহ থেকে ৪৫০ মি.লি রক্ত বের করে দিলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। তার দেহ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ লক্ষ লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি করতে পারে। দেখা গেছে কোনো সুস্থ ব্যক্তি চার মাস অন্তর রক্তদান করলে দাতার দেহে সামান্যতম কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয় না।

বর্তমানে রক্তদানে উদ্বুদ্ধকরণে নানা রকম কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। যেমন— কোনো বিশেষ দিবসে বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন। এতে জনসাধারণের মাঝে রক্তদান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও ভীতি অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। অতীতের তুলনায় মানুষ এখন রক্তদান ও গ্রহণ সম্পর্কে অধিক আগ্রহী ও সচেতন।

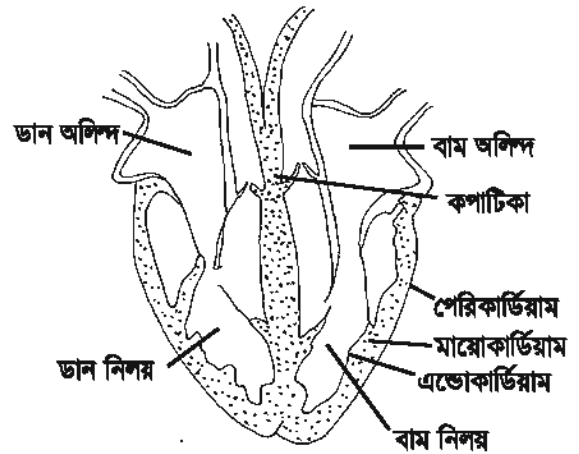
হৃদপিণ্ডের গঠন ও কাজ

হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরের বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার ফাঁপা অঙ্গ। এটি হৃদপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। হৃদপিণ্ড পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। হৃদপিণ্ড প্রাচীরে থাকে তিনটি স্তর, যথা— ১. বহিঃস্তর বা এপিকার্ডিয়াম ২. মধ্যস্তর বা মায়োকার্ডিয়াম ও ৩. অন্তঃস্তর বা এন্ডোকার্ডিয়াম।

বহিঃস্তর (Epicardium) : এটি মূলত বোজক কলা দিয়ে গঠিত। এই স্তরটিতে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি থাকে ও আবরণী কলা দিয়ে আবৃত।

মধ্যস্তর (Myocardium) : এটি বহিঃস্তর ও অন্তঃস্তরের মাঝখানে অবস্থান করে। দৃঢ় অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা এ স্তর গঠিত।

অন্তঃস্তর (Endocardium) : এটি সবচেয়ে ভিতরের স্তর। হৃদপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো অন্তঃস্তর দ্বারা আবৃত। এই স্তরটি হৃদপিণ্ডের কপাটিকাগুলোকেও আবৃত করে রাখে। হৃদপিণ্ডের ভিতরের স্তর ফাঁপা এবং চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটি নিচের প্রকোষ্ঠ দুটির চেয়ে আকারে ছোট। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান ও বাম অলিঙ্গ (right & left auricle) বলে এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান ও বাম নিলয় (right & left ventricle) বলে। অলিঙ্গদ্বয়ের প্রাচীর তুলনামূলকভাবে পাতলা, আর নিলয়ের প্রাচীর পুরু। অলিঙ্গ ও



চিত্র ৬.৭ : মানব হৃদপিণ্ড

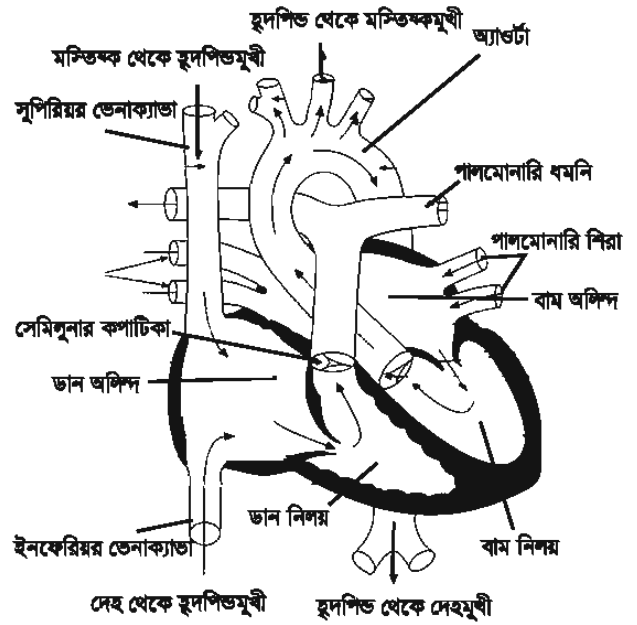
নিলয় যথাক্রমে আন্তঃঅঙ্গিন পর্দা ও আন্তঃনিলীয় পর্দা দ্বারা পরস্পর পৃথক থাকে।

হৃদপিণ্ডের উভয় অঙ্গিন ও নিলয়ের মাঝে যে ছিদ্র পথ আছে তা খোলা বা বন্ধ করার জন্য ভালভ (Valve) বা কপাটিকা থাকে। ডান অঙ্গিন ও ডান নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিদ্রপথে তিন পাল্লাবিশিষ্ট ট্রাইকাসপিড ভালভ দ্বারা সুরক্ষিত। অনুরূপভাবে বাম অঙ্গিন ও বাম নিলয় দুই পাল্লাবিশিষ্ট বাইকাসপিড ভালভ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। মহাধমনি ও ফুসফুসীয় ধমনির মুখে অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা থাকে। এদের অবস্থানের ফলে পাম্প করা রক্ত একই দিকে চলে এবং এক ফোঁটা রক্তও উল্টো দিকে ফিরে আসতে পারে না।

হৃদপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি

আমরা আগেই জেনেছি যে, হৃদপিণ্ড একটি পাম্পের ন্যায় কাজ করে। হৃদপিণ্ডের সংকোচন ও শ্রুণন বা প্রসারণ দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়। হৃদপিণ্ডের অবিরাম সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সংবহন পদ্ধতি অব্যাহত থাকে। হৃদপিণ্ডের সংকোচনকে বলা হয় সিস্টোল ও প্রসারণকে বলা হয় ডায়াস্টোল। হৃদপিণ্ডের একবার সিস্টোল-ডায়াস্টোলকে একত্রে হৃদস্পন্দন (Heart beat) বলে।

অঙ্গিনদ্বয় প্রসারিত হলে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে। যেমন- উর্ধ্ব মহাশিরার কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ডান অঙ্গিনে প্রবেশ করে। ঠিক একই সময় ফুসফুসীয় বা পালমোনারি শিরার মাধ্যমে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বাম অঙ্গিনে প্রবেশ করে।



চিত্র ৬.৮: হৃদপিণ্ডের অন্তর্গঠন ও রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি

অঙ্গিনদ্বয়ের সংকোচনের ফলে নিলয়দ্বয়ের পেশি প্রসারিত হয়। ফলে ডান অঙ্গিন-নিলয়ের ছিদ্রপথের ট্রাইকাসপিড ভালভ খুলে যায় এবং ডান অঙ্গিন থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। ঠিক একই সময়ে বাম অঙ্গিন ও বাম নিলয়ের বাইকাসপিড ভালভ খুলে যায় এবং বাম অঙ্গিন থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এর পরপরই ছিদ্রগুলোর কপাটিকা দ্বারা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নিলয় থেকে রক্ত পুনরায় অঙ্গিনে প্রবেশ করতে পারে না।

যখন নিলয়দ্বয় প্রসারিত হয় তখন ডান নিলয় থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। এখানে রক্ত পরিশোধিত হয়। ঠিক একই সময়ে বাম নিলয় থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত মহাধমনির মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত পরিবাহিত হয় এবং উভয় ধমনির অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রক্ত পুনরায় নিলয়ে ফিরে আসতে পারে না। এভাবে হৃদপিণ্ডে পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

হৃদপিণ্ডের কাজ : রক্ত সংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হৃদপিণ্ড। এর সাহায্যেই সংবহন তন্ত্রের রক্ত প্রবাহ সচল থাকে। মানব হৃদপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, তাই সংবহনতন্ত্রে উঁচু ধরনের প্রকোষ্ঠগুলো সম্পূর্ণ বিভক্ত থাকায় এখানে অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনবিহীন রক্তের সম্মিশ্রণ ঘটে থাকে না।

রক্তবাহিকা : যেসব নালির ভেতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত বা সঞ্চালিত হয় তাকে রক্তনালি বা রক্তবাহিকা বলে। এসব নালিপথে হৃদপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরায় হৃদপিণ্ডে ফিরে

আসে। গঠন, আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা বা রক্তনালি তিন ধরনের। যথা- ১. ধমনি, ২. শিরা ও ৩. কৈশিক জালিকা।

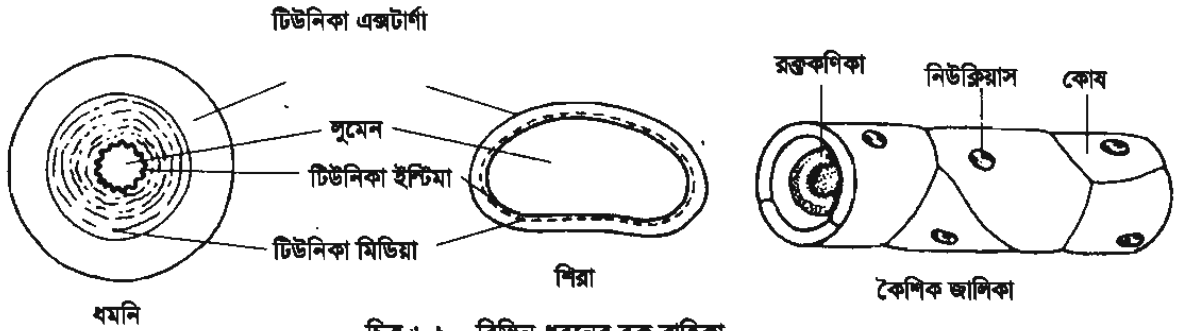
১. ধমনি (Artery) : যেসব রক্তনালির মাধ্যমে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে সারা দেহে বাহিত হয় তাকে ধমনি বলে। ফুসফুসীয় ধমনি এর ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমধর্মী ধমনি হৃদপিণ্ড থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসে পৌঁছে দেয়।

ধমনির প্রাচীর তিন স্তরবিশিষ্ট : ১. টিউনিকা এক্সটার্ণা (Tunica externa) যা তন্তুময় যোজক কলা দিয়ে তৈরি।

২. বৃন্তাকার অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে তৈরি মাঝের স্তর টিউনিকা মিডিয়া (Tunica media)।

৩. টিউনিকা ইন্টার্না (Tunica interna) নামক ভিতরের স্তরটি সরল আবরণী কলা দিয়ে তৈরি। ধমনির প্রাচীর পুরু ও স্থিতিস্থাপক। ধমনিতে কপাটিকা থাকে না, এর নালিপথ সরু। হৃদপিণ্ডের প্রত্যেক সংকোচনের ফলে দেহে ছোট বড় সব ধমনিতে রক্ত তরঙ্গের ন্যায় প্রবাহিত হয়। এতে ধমনিগাত্র সংকোচিত বা প্রসারিত হয়। ধমনির এই স্ফীতি ও সংকোচনকে নাড়িস্পন্দন বলে। ধমনির ভিতর রক্ত প্রবাহ, ধমনিগাত্রের সংকোচন, প্রসারণ ও স্থিতিস্থাপকতা নাড়িস্পন্দনের প্রধান কারণ। হাতের কবজির উপর হাত রেখে নাড়িস্পন্দন অনুভব করা যায়।

কাজ : তুমি তোমার বক্ষু, ভাই, বোনের প্রতি মিনিটের নাড়িস্পন্দন গণনা কর। দৌড়ে আসার পর পুনরায় তোমার বক্ষুর নাড়িস্পন্দন গণনা কর। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কী? কেন এমন হলো তা ব্যাখ্যা কর।



চিত্র ৬.৯ : বিভিন্ন ধরনের রক্ত বাহিকা

কৈশিক জালিকা (Capillaries) : পেশিতন্ত্রে চুলের মতো অতি সূক্ষ্ম রক্তনালি দেখা যায়। একে কৈশিক জালিকা বা কৈশিক নালি বলে। এগুলো একদিকে ক্ষুদ্রতম ধমনি ও অন্যদিকে ক্ষুদ্রতম শিরার মধ্যে সংযোগ সাধন করে। ফলে ধমনি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর কৈশিক নালিতে পরিণত হয় এবং প্রত্যেকটি কোষকে পরিবেষ্টিত করে রাখে। এদের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা। এই পাতলা প্রাচীর ভেদ করে রক্তে দ্রবীভূত সব বস্তু কোষে প্রবেশ করে।

শিরা (Veins) : যেসব নালি দিয়ে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃদপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে। এরা ধমনির মতোই সারা দেহে ছড়িয়ে থাকে। শিরাগুলো সাধারণত দেহের বিভিন্ন স্থানের কৈশিকনালি থেকে আরম্ভ হয় এবং এ রকম অসংখ্য নালি একত্রে সূক্ষ্ম শিরা, উপশিরা, অতঃপর শিরা ও মহাশিরায় পরিণত হয়ে হৃদপিণ্ডে ফিরে আসে। শিরার প্রাচীর ধমনির মতো তিন স্তরবিশিষ্ট। শিরার প্রাচীর কম পুরু, কম স্থিতিস্থাপক ও কম পেশিময়। এদের নালিপথ একটু চওড়া ও কপাটিকা থাকে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সব শিরা কার্বন ডাইঅক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে হৃদপিণ্ডে নিয়ে আসে।

কাজ : ধমনি ও শিরার মধ্যে পার্থক্য কর		
বৈশিষ্ট্য	ধমনি	শিরা
১. উৎপত্তি ও সমাপ্তি		
২. রক্ত প্রবাহের দিক		
৩. রক্তের প্রকৃতি		
৪. প্রাচীর		
৫. ভিতরের নালিপথ		
৬. কপাটিকা		
৭. অবস্থান		
৮. রক্তচাপ		

রক্তচাপ (Blood Pressure)

রক্ত প্রবাহের সময় ধমনিগাত্রে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে। হৃদপিণ্ডের সংকোচন বা সিস্টোল অবস্থায় ধমনিগাত্রে রক্তচাপের মাত্রা সর্বাধিক থাকে। একে সিস্টোলিক চাপ (Systolic Pressure) বলে। হৃদপিণ্ডের (প্রকৃতপক্ষে নিলয়ের) প্রসারণ বা ডায়াস্টোল অবস্থায় রক্তচাপ সবচেয়ে কম থাকে। একে ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic Pressure) বলে। স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ মাপা যায়। এই যন্ত্র দ্বারা ডায়াস্টোলিক ও সিস্টোলিক চাপ দেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় একজন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তির সিস্টোলিক বা সংকোচন রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ১০০-১৫০ মিলিমিটার এবং ডায়াস্টোলিক বা প্রসারণ চাপ পারদ স্তম্ভের ৬৫-৯০ মিলিমিটার।

আদর্শ রক্তচাপ : চিকিৎসকদের মতে পরিণত বয়সে একজন মানুষের আদর্শ রক্তচাপ (Blood pressure) সাধারণত ১২০/৮০ মানের কাছাকাছি। রক্তচাপকে দুটি সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়। একটি উচ্চমান অন্যটি নিম্নমান। রক্তের উচ্চ চাপকে সিস্টোলিক (Systolic) চাপ বলে যার আদর্শ মান ১২০ বা এর কিছু নিচে। নিম্নচাপকে ডায়াস্টোলিক (Diastolic) চাপ বলে। এই চাপটির আদর্শ মান ৮০ বা এর নিচে। এই চাপটি হৃদপিণ্ডের দুটি বিটের মাঝামাঝি সময় রক্তনালিতে সৃষ্টি হয়। দুধরনের রক্তচাপের পার্থক্যকে ধমনিঘাত বা নাড়ীঘাত চাপ (Pulse pressure) বলা হয়। সাধারণত সুস্থ অবস্থায় হাতের কজীতে পাল্স-এর মান প্রতি মিনিটে ৭০। হাতের কজীতে হালকা করে চাপ দিয়ে ধরে পাল্স রেট বের করা যায়। বিপি যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের চাপ নির্ণয় করা হয়।

উচ্চ রক্তচাপ (High blood pressure or hypertension) : উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক হিসেবে গণ্য করা হয়। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০২০ সালের মধ্যে স্ট্রোক ও করোনারি ধমনির রোগ হবে বিশ্বের এক নম্বর মরণব্যাদি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়বে মহামারী আকারে। হৃদরোগ ও স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ হলো উচ্চ রক্তচাপ।

উচ্চ রক্তচাপ কী? রক্ত চলাচলের সময় রক্তনালি গায়ে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে। আর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তচাপকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সিস্টোলিক চাপ ১২০ এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৮০ বা এর নিচের মাত্রাকে কাক্সিকৃত মাত্রা হিসেবে ধরা হয়। আর এই রক্তচাপ যখন মাত্রাতিরিক্ত হয় তখনই আমরা তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে থাকি।

যে সব কারণে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকি থাকে : বাবা বা মায়ের উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তার সন্তানদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এছাড়াও যারা স্নায়বিক চাপে (Tension) বেশি ভোগেন অথবা ধূমপানের অভ্যাস থাকলে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দেহের ওজন বেশি বেড়ে গেলে কিংবা খাদ্যে লবণ ও চর্বিযুক্ত উপাদান বেশি খেলে এমনকি পরিবারের সদস্যদের ডায়াবেটিস বা কোলেস্টেরোলের পূর্ব ইতিহাস থাকলে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়। সন্তান প্রসবের সময় খিচুনি রোগের (Eclamsia) কারণে মায়ের উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়।

উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ : মাথা ব্যথা, বিশেষ করে মাথার পেছন দিকে ব্যথা করা প্রাথমিক লক্ষণ। এছাড়াও রোগী মাথা ঘোরা, ঘাড় ব্যথা করা, বুক ধড়ফড় করা ও দুর্বল বোধ করে। অনেক সময় রোগীর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীর সুনিদ্রা হয় না এবং অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠে।

রক্তচাপ নির্ণয় করা : রক্তচাপ মাপক যন্ত্র দিয়ে রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়। রক্তচাপ মাপার শুরুতে রোগীকে কয়েক মিনিট নিরিবিলা পরিবেশে শান্তভাবে সোজা হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। রক্তচাপ মাপার সময় কমপক্ষে দুইবার ১ থেকে ২ মিনিট ব্যবধান রেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা ভালো।

উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকার : উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকারে টাটকা ফল ও শাক-সবজি খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রেখে শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম করা প্রয়োজন। চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ছাড়াও খাবারের সময় অতিরিক্ত লবণ না খাওয়া এবং কাঁচা লবণ খাওয়া সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা দরকার। ধূমপান ত্যাগ করা জরুরি।

কাজ : রক্তচাপ মাপার কৌশল আয়ত্ত্ব করে তোমার বন্ধুদের রক্তচাপ নিচের ছকে উপস্থাপন কর।		
শিক্ষার্থীর নাম	রক্তচাপ (সিস্টোল/ডায়াস্টোল)	মন্তব্য

কর্মতৎপরতা, স্বাস্থ্য, বয়স এবং রোগের কারণে মানুষের রক্তচাপের মাত্রা কমবেশি হতে পারে। মোটা লোকদের ওজন কমানো, চর্বিজাতীয় খাদ্য কম খাওয়া, খাবারে কম লবণ দেওয়া ইত্যাদি নিয়মগুলো মেনে চললে উচ্চ রক্তচাপ এড়ানো যায়। রক্তচাপ খুব বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ঔষধ সেবন করা উচিত।

কোলেস্টেরোল

কোলেস্টেরোল (Cholesterol) : কোলেস্টেরোল হাইড্রোকার্বন কোলেস্টেইন (Cholestane) থেকে উৎপন্ন একটি যৌগ। একটি উচ্চশ্রেণির প্রাণিজ কোষের এটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোলেস্টেরোল লিপোপ্রোটিন নামক যৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তে প্রবাহিত হয়। তিন প্রকার লিপোপ্রোটিন দেখা যায়। একটিকে এলডিএল বা LDL (Low Density

Lipoprotein) বলা হয়। অনেকে একে খারাপ কোলেস্টেরোল বলে থাকে। সাধারণত আমাদের রক্তে ৭০% LDL থাকে। ব্যক্তি বিশেষে এই পরিমাণের পার্থক্য দেখা যায়। রক্তে এইচডিএল বা HDL (High Density Lipoprotein) কে সাধারণত ভালো কোলেস্টেরোল বলা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন HDL হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। শরীরিক বৃদ্ধিতে HDL LDL-এর ঠিক উল্টো কাজ করে থাকে।

তৃতীয় ধরনের লিপোপ্রোটিনকে ট্রাই-গ্লিসারাইড (Triglyceride) বলা হয়। এই কোলেস্টেরোল আমাদের খাদ্যে এবং শরীরে চর্বি হিসেবে থাকে। এ কারণে রক্তের প্লাজমায় এরা অবস্থান করে। রক্তের চর্বিকে ট্রাই-গ্লিসারাইড ও কোলেস্টেরোল মিলিত এক যৌগ হিসেবে দেখা হয়। ট্রাই-গ্লিসারাইড আমাদের খাদ্যের প্রাণীজ চর্বি অথবা কার্বোহাইড্রেট থেকে তৈরি হয়ে থাকে। নিম্নের সারণিতে রক্তে কোলেস্টেরোলের আদর্শ মান দেখান হলো।

কোলেস্টেরোলের প্রকার	পুরুষের মান গ্রাম/ডেসি লিটারে	মহিলাদের মান গ্রাম/ডেসি লিটারে
LDL	১.৬৮– ৪.৫৩	১.৬৮– ৪.৫৩
HDL	০.৯০– ১.৪৫	০.৯০– ১.৬৮
ট্রাই-গ্লিসারাইড	০.৪৫– ১.৮১	০.৪০– ১.৫৩

অধিক মাত্রার কোলেস্টেরোল উপস্থিত এমন খাদ্যের মধ্যে মাখন, চিগুড়ি, বিনুক, গবাদিপশুর যকৃত, ডিম, বিশেষ করে ডিমের কুসুম উল্লেখযোগ্য।

রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরোলের সমস্যা

রক্তে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরোল থাকলে বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়। অ্যাথারোস্কেলোসিস (Atherosclerosis) অবস্থা সৃষ্টি হবার ফলে ধমনিতে রক্ত চলাচলের জায়গা কমে যায়। করোনারি হৃদরোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপের ব্যাঘাত ঘটে যখন কোলেস্টেরোল জমাট বেঁধে ধমনির রক্তপ্রবাহে বাধা দেয়। ফলে রক্তে অক্সিজেনের অভাবে হৃদযন্ত্রের পেশি নষ্ট হয়ে যায়। হৃদপিণ্ডের রক্ত চলাচল কমে যাবার ফলে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। এই অবস্থাকে অ্যানজিনা (Angina) বলা হয়। যখন মস্তিষ্কের কোনো অংশের শিরা বা ধমনি ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সে অবস্থাকে স্ট্রোক (Stroke) বলে। এ অবস্থায় মস্তিষ্কের স্নায়ু মারা যেতে থাকে। ফলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

কোলেস্টেরোলের কাজ– উপকারিতা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি

কোলেস্টেরোল কোষপ্রাচীর তৈরি ও রক্ষার কাজ করে। প্রতিটি কোষের ভেদ্যতা (Permeability) নির্ণয় করে বিভিন্ন দ্রব্যাদি কোষে প্রবেশ বা বাধা প্রদান করে। মানবদেহের জনন হরমোন এনড্রোজেন ও ইস্ট্রোজেন তৈরিতে সাহায্য করে। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির হরমোন তৈরিতে কোলেস্টেরোল ব্যবহৃত হয়। কোলেস্টেরোল পিণ্ড তৈরি করে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে চামড়ায় কোলেস্টেরোল থেকে ভিটামিন ‘ডি’ তৈরি হয়। শরীরে ফ্যাট দ্রবণীর ভিটামিন যেমন, ভিটামিন–এ, ডি, ই ও কে বিপাকে কোলেস্টেরোল প্রয়োজন হয়। স্নায়ুকোষের কার্যকারিতার জন্যে কোলেস্টেরোল প্রয়োজন। দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে কোলেস্টেরোল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

গবেষণায় এখন প্রমাণিত যে রক্তে উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরোল হৃদপিণ্ড এবং রক্ত সঞ্চালনের বিশৃঙ্খলার সাথে জড়িত। পিণ্ডের অন্যতম উপাদান হলেও এটি একটি বর্জ্য পদার্থ এবং যকৃতের মাধ্যমে দেহ থেকে অপসারিত হয়। পিণ্ডে

কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে তা তলানির মতো পিণ্ড থলিতে জমা হয়। কোলেস্টেরলের এ তলানিই শক্ত হয়ে পিণ্ডথলির পাথর (Gall bladder stone) নামে পরিচিত হয়। ম্যালেরিয়া, বহুমূত্র, স্ফিলিস প্রভৃতি রোগে এবং অ্যালকোহল, কার্বন মনোক্সাইড, ফসফরাস ইত্যাদির বিষক্রিয়ায় যকৃতে লিপিডের পরিমাণ ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। এই অবস্থাকে মেদবহুল যকৃৎ (Fatty liver) বলা হয়।

রক্তের অস্বাভাবিকতা – লিউকেমিয়া (Leukemia)

একজন সুস্থ মানুষের শরীরে তিন ধরনের রক্তকোষ থাকে। রক্তের লাল কোষগুলি লোহিত রক্তকণিকা, যা শরীরে অক্সিজেন সরবরাহের কাজ করে। শ্বেত রক্তকণিকা বাইরে থেকে কোনো বস্তু বা জীবাণু রক্তে প্রবেশ করলে অতি সহজেই তা ধ্বংস করে। অণুচক্রিকা রক্তবাহী নালির ক্ষতি হলে রক্ত জমাট বাঁধায় সাহায্য করে। রক্ত কণিকাগুলো মানব শরীরের অস্থিমজ্জায় তৈরি হয়।

রক্তকোষের ক্যানসারকে লিউকেমিয়া (Leukemia) বলে। লিউকেমিয়া হলে দেহের অস্থিমজ্জা থেকে অস্বাভাবিক মাত্রায় শ্বেত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। ফলে হৃদযন্ত্রের সমস্যা, শ্বাস গ্রহণে কষ্ট বা বুকে ব্যথা, নাক থেকে রক্ত পড়া, চামড়ায় ঘা তৈরি, হাত ও পায়ের জোড়ায় ব্যথা ও ফুলে উঠা, হাত বা পা কাঁপতে থাকা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। মানুষের কয়েক ধরনের লিউকেমিয়া দেখা যায়। অনেক সময় এ রোগ দ্রুত বৃদ্ধির ফলে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

রক্ত সংবহনতন্ত্রের কয়েকটি রোগ ও প্রতিকার

হার্ট অ্যাটাক

যখন কারও হৃদযন্ত্রের কোনো অংশ রক্ত জমাট বাঁধার কারণে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বাঁধাগ্রস্ত হয়, এতে হৃদপিণ্ডের কোষ কিংবা হৃদপেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে মায়োকারডিয়াল ইনফার্কশন অথবা করোনারী প্রোমবসিস নামে হার্ট অ্যাটাক ঘটে। বাংলাদেশে হৃদরোগ বিশেষ করে করোনারী (Coronary) হৃদরোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ড রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও খাবারের সারবস্তু অর্থাৎ পুষ্টিকর পদার্থ রক্তনালির মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয়। নিজের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য অর্থাৎ তার মাংসপেশির শক্তি অর্জনের জন্য হৃদপিণ্ডের তিনটি প্রধান রক্তনালি আছে। এগুলোর মধ্যে অনেক সময় চর্বি জমে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলে প্রাণঘাতী রোগ হার্ট অ্যাটাক হয়। বর্তমান সময়ে হার্ট অ্যাটাকে শুধু ৪০-৬০ বছর বয়সী লোকেরাই আক্রান্ত হচ্ছে না, অনেক ক্ষেত্রে ১৮ বছরের তরুণরাও এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

এ রোগের কারণগুলোর মধ্যে দেহের ওজন বেড়ে যাওয়া প্রধান। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস যেমন অধিক তেলযুক্ত খাবার (বিরানি, তেহারি ইত্যাদি), ফাস্টফুড (বার্গার, বিফ বা চিকেন প্যাটিস ইত্যাদি) খাওয়া, অলস জীবনযাপন এবং শারীরিক পরিশ্রম না করার ফলে এই রোগ দেখা যায়। তদুপরি সর্বদা হতাশা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিমর্ষ থাকায় যেকোনো বয়সে এই রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

রোগের লক্ষণসমূহ : হার্ট অ্যাটাক হলে বুকে অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হয়। বিশেষ করে বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করা যা প্রাথমিকভাবে এন্টাসিড জাতীয় ঔষধ খেলেও কমবে না। ব্যথা বাঁ দিকে বা সারা বুকে ছড়িয়ে যেতে পারে। ব্যথা অনেক সময় গলা ও বাম হাতে ছড়িয়ে যায়। রোগী প্রচণ্ডভাবে ঘামতে থাকে ও বুকে ভারি চাপ অনুভব করছে বলে মত প্রকাশ করে।

প্রতিকার : এমন অবস্থা দেখা দিলে অবহেলা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইসিজি করিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ দেওয়া দরকার।

করোনারি হৃদরোগ এক মারাত্মক হৃদরোগ। এ রোগ থেকে বাঁচতে হলে নিচে কিছু নিয়ম মেনে চলা দরকার, যাতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যেমন— ধূমপান না করা ও নিয়মিত ব্যায়াম করা বা হাঁটা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা, কাঁচা ফল ও শাকসবজি বেশি বেশি খাওয়া। চর্বিযুক্ত খাবার না খাওয়া, ভাজা খাবার, মশলাযুক্ত খাবার, ফাস্টফুড খাওয়া বাদ দেওয়া।

হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখার উপায়

মানুষ পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হবার আগে থেকেই তার হৃদযন্ত্র কাজ করা শুরু করে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট গতিতে চলতে থাকে। মানুষের বাঁচামরায় হৃদযন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখার জন্য সঠিক জীবনধারা (Life Style) ও খাদ্য নির্বাচনের প্রয়োজন রয়েছে। নানা ধরনের তেল বা চর্বি জাতীয় খাদ্য হৃদযন্ত্রের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। রক্তের কোলেস্টেরোল হৃদপিণ্ডের রক্তনালিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে থাকে।

মাদক ও নেশা সেবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বা হৃদস্পন্দন সাধারণ মানের থেকে বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদকসেবী কিছুটা মানসিক আনন্দ ও প্রশান্তি পেলেও তার হৃদযন্ত্রের প্রভূত ক্ষতি হয়। ধূমপান অথবা জর্দার নিকোটিনের বিষক্রিয়া শরীরের অন্য অংশের মতো হৃদপেশির ক্ষতি করে। সঠিক খাদ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সুস্থ থাকা যায়। মেদ সৃষ্টিকারী খাদ্য যেমন তেল, চর্বি, অতিরিক্ত শর্করা, সুযম খাদ্য গ্রহণ ও পরিহার করে, প্রতিদিন পরিমিত ব্যায়াম এবং হাঁটা-চলার মাধ্যমে সুস্থ জীবন লাভ করা যায়।

বাতজ্বর (Rheumatic Fever)

স্ট্রেপটোককাস (Streptococcus) অণুজীবের সংক্রমণে সৃষ্ট শ্বাসনালির প্রদাহ, ফুসকুড়িযুক্ত সংক্রামক জ্বর, টনসিলের প্রদাহ অথবা মধ্যকর্ণের সংক্রামক রোগ বাতজ্বরের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সাধারণত শিশুকালেই এ রোগের আক্রমণ শুরু হয় এবং দেহের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হয়, বিশেষ করে হৃদপিণ্ড। হৃদপিণ্ড যদি এ রোগে পূর্ণভাবে আক্রান্ত নাও হয়, হৃদপেশি এবং হৃদপিণ্ডের কপাটিকা বা ভালভ অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে হৃৎপিণ্ড যথাযথভাবে রক্ত পাম্প করতে সক্ষম হয় না এবং দেহে রক্ত প্রবাহের পরিমাণ কমে যায়।

অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা এ রোগ সহজে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন। পরে রোগের প্রকোপ বেড়ে গেলে ওজন হ্রাস, এনিমিয়া, ক্লান্তি, ক্ষুধামন্দা, চেহারা ফ্যাকাশে ভাব ইত্যাদি দেখা দেয় এবং রোগের উপস্থিতি বুঝা যায়। পরবর্তী সময়ে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, ফুলে যাওয়া এবং ত্বকে লালচে রঙ দেখা দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ শনাক্ত করা গেলে পেনিসিলিন জাতীয় (Penicillin) ঔষধ যথাযথভাবে প্রয়োগে এ রোগের সংক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অনেক চিকিৎসক আক্রান্ত ছেলেমেয়েদের প্রাপ্ত বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পেনিসিলিন খাবার পরামর্শ দেন।

৪. তাসমিয়া—

- i. রক্তে A, B এন্টিজেন বহন করে
- ii. রাফিনকে রক্ত দান করতে পারবে
- iii. তামিমের রক্ত গ্রহণ করতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

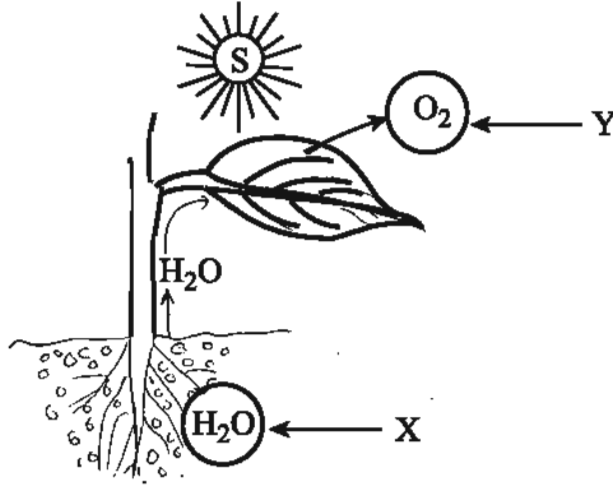
খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



ক. সংলগ্নতা কী?

খ. ইমবাইভিশন বলতে কী বুঝ?

গ. S উপাদানটির অনুপস্থিতি প্রক্রিয়াটিতে কীরূপ প্রভাব পড়বে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. X উপাদানটি যদি Y অঞ্চলে না পৌঁছায় তাহলে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কী সমস্যা দেখা দিবে বিশ্লেষণ কর।

২. হাসান সাহেবের বয়স ৫০। তিনি একটি আর্থিক ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি মাথাব্যথা, বুক ধড়কড় এবং অস্থিরতা ভাব অনুভব করছেন। অন্যদিকে তার ৭ বছর বয়সী মেয়ে মূনের গিটে ব্যাথা, ফুলে যাওয়া, ত্বকে লাগচে ভাব দেখা যাচ্ছে। তারা দুজন ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

ক. রক্ত কী?

খ. শ্বেতকণিকা কীভাবে দেহকে রক্ষা করে? বুঝিয়ে লেখ।

গ. হাসান সাহেবের সমস্যাগুলোর কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্ভিদকে উল্লিখিত সমস্যা দুটির মধ্যে কোনটি অনিরাশয়যোগ্য যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।